ইউনিট ১৫

পাকিস্তানি শাসন, শোষণ এবং পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন

ভূমিকা

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট এক হাজার মাইলের অধিক ব্যবধান এবং বিচ্ছিন্নতাসহ পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে গঠিত হয়েছিল পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির শুরু থেকেই পূর্ব বাংলা প্রদেশকে পাকিস্তানের একটি উপনিবেশে পরিণত করার প্রচেষ্টা চালায়। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অত্যন্ত সুকৌশলে পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন শুরু করে। যার ফলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় ব্যাপক বৈষম্যের পাহাড়। পাকিস্তানি অপশাসন ও শোষণের ফলে পূর্ব বাংলার সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে থাকে। পাকিস্তানের দুই অংশের উন্নয়ন ও বাস্তব পরিস্থিতিতে ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও শোষণের অভিঘাতে পূর্ববাংলা প্রথমে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের দাবি তোলে। অতঃপর ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচন, ফলাফল বানচাল এবং পরবর্তী অসহযোগ আন্দোলনের পথ ধরে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো –

পাঠ-১	:	পাকিস্তানি অপশাসন ও শোষণের বিভিন্ন পর্যায় ও প্রক্রিয়া।
পাঠ-২	:	ভাষা আন্দোলন ও এর তাৎপর্য।
পাঠ-৩	:	১৯৫৪ সালের নির্বাচন, যুক্তফ্রন্ট গঠন ও এর তাৎপর্য।
পাঠ-৪	:	বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৬ দফা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান।
পাঠ-৫	:	মার্চের অসহযোগ আন্দোলন এবং একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ।

পাঠ-১ : পাকিস্তানি অপশাসন ও শোষণের বিভিন্ন পর্যায় ও প্রক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- পাকিস্তানি শাসনের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে জানতে পারবেন ।
- পূর্ব পাকিস্তানের উপর বৈষম্যের চিত্র বর্ণনা করতে পারবেন ।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র সংরক্ষণের জন্য । কিন্তু একদিকে প্রশাসনে স্বেচ্ছাচারী শাসন আর অন্যদিকে পূর্ববাংলার উপর শোষণ, বঞ্চনা আর স্বৈরাচারী শাসন ও শোষণ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের মধ্যে পূর্ব বাংলা পরিণত হয় পশ্চিম পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে । এছাড়া সামরিক শাসনের ছত্রচ্ছায়ায় পূর্ববাংলাকে নির্দয়ভাবে অবদমন করা হয় । পাকিস্তানি উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের ফলে পূর্ববাংলার সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়ে যায় । শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ আচরণের ফলে পূর্ববাংলার ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতির বিকাশে এবং রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় ।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই স্বেচ্ছাচারী শাসন কায়েম হয় । গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৩ সালের ১৬ এপ্রিল নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভাকে বাতিল করেন । মোহাম্মদ আলীকে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে স্বেচ্ছাচারিতার ভিত্তিতে নতুন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন । ১৯৫৫ সালের ৮ নভেম্বর গণপরিষদ বাতিল করা হয় । পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতা মোকাবেলার জন্য পূর্ব ও পশ্চিমের সব প্রদেশ সংযুক্ত করে এক ইউনিট গঠন করে সংখ্যা সাম্যনীতি গ্রহণ করা হয় । জন্মলাভের নয় বছর পর ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানে প্রথম সংবিধান রচনা করা হয় । ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জা সামরিক শাসন জারি করেন । পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খান ২০ দিনের মাথায় তাকে সরিয়ে নিজে ক্ষমতায় আসীন হন এবং সংবিধান বাতিল করে দেন । ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র পদ্ধতি নির্ভর সংবিধান প্রণয়ন করেন । ১৯৬৯ এর মার্চে পূর্ববাংলার গণ আন্দোলনে টিকতে না পেরে সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়ার হাতে ক্ষমতা দিয়ে তিনি রাজনীতি থেকে বিদায় নেন । জেনারেল ইয়াহিয়া পুনরায় সামরিক শাসন জারি করেন । এইভাবে পাকিস্তানের আইন পরিষদকে অকার্যকর এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হয় । দীর্ঘ ২৪ বছরই সামরিক চক্র ও আমলারা দেশ শাসন করেন ।

১৯৪৭ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত পাকিস্তানের উভয় অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল প্রকট । ১৯৪৭-৪৮ সালে জাতীয় আয়ের প্রায় ৫২ ভাগই ছিল পূর্ববাংলার অবদান । কিন্তু ১৯৫৯-৬০ সালে তা কমে যায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক আয় বৃদ্ধি পায় । ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব ও পশ্চিম অংশের বৈষম্যের মাত্রা ছিল ১৯ ভাগ । কিন্তু ১৯৫৯-৬০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ৩২ ভাগে এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে তা আরও বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ৫৫ ভাগে । ১৯৪৭-৬৬ সালের বৈদেশিক সাহায্যের মাত্র ৩৪ ভাগ ব্যয় করা হয় পূর্ব বাংলায়, যদিও জনসংখ্যার দিক থেকে পূর্ব বাংলা ছিল শতকরা ৫৬ ভাগ । ১৯৬৬ সালের দিকে শিল্পের শতকরা ৬৬ ভাগ, ব্যাংকের শতকরা ৮০ ভাগ এবং বীমার শতকরা ৯৭ ভাগই পশ্চিম পাকিস্তানের মাত্র ২২টি পরিবারের হাতে চলে যায় । এ সময় পূর্ব বাংলা মূলত পশ্চিম পাকিস্তানের কাঁচামালের যোগানদাতাও বাজারে পরিণত হয় ।

১৯৪৭-৬৭ পর্যন্ত মোট বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয় ৩৯৯৯ কোটি টাকা । পূর্ব বাংলার অর্জন ছিল এর মধ্যে ২২৪০ কোটি টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জন ছিল ১৭৫৯ কোটি টাকা । অথচ ১৯৪৭-৬১ পর্যন্ত শাসন খাতে মোট ব্যয় ২২১৬ কোটির মধ্যে পূর্ব বাংলা মাত্র ২৬৯ কোটি টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৪৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয় । ১৯৫০-১৯৭০ পর্যন্ত পাকিস্তানে উন্নয়ন খাতে মোট ব্যয় করা হয় ৭৫০৯ কোটি টাকা । এর মধ্যে পূর্ব বাংলায় ব্যয় করা হয় ২১১৪ কোটি টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় ৫৩৯৫ কোটি টাকা । ১৯৪৭-৬৯ সালে সামরিক খাতে মোট ব্যয় হয় ২৪২৪ কোটি টাকা কিন্তু পূর্ব বাংলায় ব্যয় হয় ২২৪ কোটি টাকা আর পশ্চিম

পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় ২২০০ কোটি টাকা। ১৯৪৭-১৯৬০ পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ থেকে প্রাপ্ত মোট ৫৪২১৫ কোটি টাকার মধ্যে পূর্ব বাংলা পায় ৯৩.৮৯ কোটি টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তান পায় ৪৪৮.২৫ কোটি টাকা। সামরিক ও বেসামরিক খাতে মোট ব্যয় ৩১৫৯ কোটি টাকার মধ্যে পূর্ব বাংলায় ব্যয় হয় ৪২৪ কোটি টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় ২৭৩৫ কোটি টাকা।

পাকিস্তানের স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীতে বাঙালি প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে বঞ্চনার শিকার হন। ১৯৪৭-১৯৭১ পর্যন্ত পূর্ববাংলার প্রতিনিধিত্ব ছিল যথাক্রমে শতকরা ৫ ভাগ, ১০ ভাগ এবং ১৬ ভাগ। ১৯৬৬ সালে পাকিস্তানি শাসন ব্যবস্থায় প্রথম শ্রেণীর মোট ২৮১৬ জনের মধ্যে পূর্ব বাংলার ৭৩২ জন শতকরা ২৩ ভাগ বাকি ৭৭ ভাগ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের দখলে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মোট ৫৯১৬ জনের মধ্যে শতকরা ২৬ ভাগ পূর্ব বাংলার এবং ৭৪ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের। ঠিক একই ভাবে তৃতীয় শ্রেণীর মোট ৭০,০০০ হাজার কর্মচারীর মধ্যে পূর্ব বাংলা শতকরা ২৭ ভাগ আর পশ্চিম পাকিস্তান ৭৩ ভাগ। চতুর্থ শ্রেণীর মোট ২৬,০০০ হাজার কর্মচারীর মধ্যে পূর্ব বাংলার শতকরা ৩০ ভাগ এবং ৭০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের।

উপরিউক্ত তথ্যে প্রমাণিত হয় যে, পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, প্রশাসনিক সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রেই ব্যাপক বৈষম্য বিদ্যমান ছিল, যার পরিণতি পূর্ব বাংলা রুখে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম প্রধান দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক, সামাজিক স্বার্থ সংরক্ষণ (Protection of Interests) এবং বাঙালি জাতি-পরিচিতি সংরক্ষণ ((Preservation of Identity)। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ এর স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকাল অবধি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রেকর্ডকৃত সকল আন্দোলন, অভ্যুত্থান, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, দ্রোহ ও যুদ্ধে এই সত্যই প্রমাণিত হয়।

সারসংক্ষেপ

ভৌগোলিক ব্যবধান, বাঙালি-জাতির পরিচিতি ও ভাষা-সংস্কৃতির উপর আগ্রাসন, পশ্চিমাদের স্বেচ্ছাচারী শাসন, অর্থনৈতিক শোষণ, বঞ্চনা এবং বাঙ্গালিসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম ও সর্বোপরি স্বাধীনতাযুদ্ধই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির বাস্তবরূপ দান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পাকিস্তানে প্রথম সংবিধান প্রণীত হয়-

(ক) ১৯৫৬ সনের ২৩ মার্চ (খ) ১৯৫৬ সনের ২১ ফেব্রুয়ারি
(গ) ১৯৫৬ সনের ২৯ সেপ্টেম্বর (ঘ) ১৯৫৬ সনের ২ মার্চ

২। ফিল্ড মার্শাল মোঃ আইয়ুব খান গণ অভ্যুত্থানে টিকতে না পেরে ক্ষমতা দেন-

(ক) খাজা নাজিমুদ্দিনকে (খ) টিক্কা খানকে
(গ) ইয়াহিয়া খানকে (ঘ) জুলফিকার আলী ভুট্টোকে

৩। পাকিস্তানের ইতিহাসে সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একমাত্র সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়-

(ক) ১৯৫৪ (খ) ১৯৭০
(গ) ১৯৬২ (ঘ) ১৯৬৬

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। পূর্ব বাংলার উপর পাকিস্তানি শাসন-শোষণের প্রক্রিয়া আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

১। (ক), ২। (গ), ৩। (খ)

পাঠ ২ : ভাষা আন্দোলন ও এর তাৎপর্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮-১৯৫২)

বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ সৃষ্টিতে ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ এ দুটি পর্যায় রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব বাংলার ছাত্র-জনতার আন্দোলন এক যুগান্তকারী ঘটনা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের ভাষা ও সংস্কৃতির বিনাশ সাধনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ১৯৪৭ সালেই করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করা হয়। এর বিরুদ্ধে অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে তমুদ্দুন মজলিস, ১৯৪৭ সালে প্রথমে নূরুল হক ভূঁইয়া পরে সামছুল হকের নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এ পরিষদ পূর্ব বাংলার শিক্ষার মাধ্যম ও অফিস-আদালতে সর্বত্র বাংলা ভাষার ব্যবহার এবং সমগ্র পাকিস্তানে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দানের দাবি তোলে। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বিষয়টি গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে উত্থাপিত হয়। তখন সমগ্র পূর্ব বাংলাব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট, শোভাযাত্রা এবং প্রবল দাবির মুখে পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ভাষার দাবি মেনে নেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে এক চুক্তি করেন।

কিন্তু ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ রেসকোর্সে এবং ২৪ মার্চ কার্জন হলের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব ঘোষণা করেন। এতে পূর্ববাংলার শিক্ষার্থী, শিক্ষক, পেশাজীবী, জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান কর্তৃক গণপরিষদে পেশকৃত 'মূলনীতি কমিটির' রিপোর্টে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এতে গণপরিষদের বাঙালি সদস্যগণ এবং পূর্ববাংলার জনগণ বিক্ষুব্ধ হন। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা প্রদান করলে সমগ্র পূর্ববাংলায় তীব্র বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ শুরু হয়ে যায়। কেননা ১৯৫১ সালে ভাষার ভিত্তিতে পাকিস্তানের জনগণের শতকরা হার অনুযায়ী বাংলা ছিল ৫৬.৪০ ভাগ আর উর্দু ছিল ৩.২৭ ভাগ।

খাজা নাজিমুদ্দিনের ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। ৩১ জানুয়ারি সর্বদলীয় কর্মী সমাবেশে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কার্যকরী পরিষদ' গঠিত হয়। এ সভায় স্থির হয় ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে। রাষ্ট্রভাষা দিবস কর্মসূচি সফল করে তোলার জন্য ৪ ফেব্রুয়ারি 'হরতাল' এবং ১১ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি 'পতাকা দিবস' পালিত হয়। কারাগারে আটক অবস্থায় ১৯৫২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা' ও 'বন্দীমুক্তির' দাবিতে শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগ নেতা মহিউদ্দিন আহমদ আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করেন।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সমগ্র পূর্ব বাংলায় ধর্মঘট, সভা, শোভাযাত্রা চলতে থাকে। নূরুল আমীনের মুসলিম লীগ সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল থেকে এক মাসের জন্য ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে এবং সভা, সমাবেশ ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের আমতলায় এক ঐতিহাসিক সভায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে (বর্তমানে জগন্নাথ হল মিলনায়তন) গমনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে ঢাকায় ছাত্র-জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করলে মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের সামনে লাঠি চার্জ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের পর পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও পরে শফিউদ্দিন নিহত হন। এই বর্বর হত্যার প্রতিবাদে পূর্ব বাংলার ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবীসহ সর্বস্তরের

জনতা প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে রাতারাতি ছাত্রজনতা গড়ে তোলে শহীদ মিনার যা ২৪ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করেন শহীদ শফিউদ্দিনের পিতা। ২১ ফেব্রুয়ারির বর্বর হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভের প্রচণ্ডতার কাছে পরাজয় স্বীকার করে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবিকে মেনে নেয়।

পরে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে তা অন্তর্ভুক্ত করে। বাংলাদেশের জনগণের এই ভাষা জাগরণই 'ভাষা আন্দোলন' নামে পরিচিত।

ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই পূর্ব-বাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠীর জাতীয় চেতনার সর্বপ্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিম্নরূপ :

১. ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালির স্বাধিকার এবং জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা উন্মেষের আন্দোলন। এ আন্দোলন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির আন্দোলন হলেও ভাষার দাবি পূরণের জন্য রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের প্রয়োজন ছিল। তাই এ আন্দোলন রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে।

২. ভাষা আন্দোলন বাঙালি জনগণের মধ্যে ভাষা ভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটায়। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালিরা সর্বপ্রথম নিজেদের স্বতন্ত্র স্বত্তা, স্বতন্ত্র অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। একমাত্র ধর্ম ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে বাঙালিদের অন্য কোন সম্পর্ক নেই তা বাঙালিরা প্রথমবারের মত উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

৩. ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জনগণ নিজেদের অধিকার এবং ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ে সচেতন হয়ে ওঠেন।

৪. ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জনগণ উপলব্ধি করে যে, সংগ্রামের মাধ্যমেই তাদের দাবি-দাওয়া আদায় করতে হবে এবং মুক্তির পথ খুঁজে বের করতে হবে।

৫. ভাষা আন্দোলনে সৃষ্ট জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা বাঙালি জনগণকে স্বতন্ত্র স্বার্থ, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের থেকে পৃথক করতে শেখায়।

৬. ভাষা আন্দোলনের পর থেকে ছাত্রসমাজের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়।

১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ ২১ ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণা করে। বাংলাভাষা আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করে। ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত হয়।

বাঙালিদের অধিকারবোধ, স্বাতন্ত্র্যের সচেতনতা ও জাতীয় চেতনার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের পথ ধরে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ভাষা আন্দোলন উদ্বুদ্ধ করে। ২১শের চেতনা থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। এই জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকেই উদ্ভব হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। সুতরাং আমাদের জাতীয় জীবনে ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য অসীম।

সারসংক্ষেপ

ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটায় এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ লাভ করে। কেননা বাঙালি এই ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রেরণা পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রেসকোর্স ময়দানে এবং কার্জন হলে 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' বলেন-

(ক) খাজা নাজিমুদ্দিন (খ) লিয়াকত আলী খান

(গ) মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ (ঘ) আবুল কাশেম

২। ভাষা আন্দোলন সংগঠিত ভাবে সর্বপ্রথম শুরু করে-

(ক) তমুদ্দন মজলিশ (খ) কৃষক প্রজাপার্টি

(গ) তফসিল ফেডারেশন (ঘ) মুসলিম লীগ

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

(গ) উত্তরমালা

১। (গ), ২। (ক)

পাঠ-৩ : ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, যুক্তফ্রন্ট গঠন ও এর তাৎপর্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ফলাফল ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ ও বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে এ অঞ্চলের মানুষ প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা ও উন্নয়ন থেকে নানাভাবে বঞ্চিত হয়। ফলে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বাড়তে থাকে। পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতিবাদ ও ক্ষোভ তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯৪৬ সালের পর ১৯৫১ সালে প্রদেশগুলোতে নির্বাচন হবার কথা ছিল। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোতে নির্বাচন দিলেও পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের সম্ভাব্য পরাজয়ের ভয়ে নির্বাচন দেয়নি। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে পূর্ব বাংলার কয়েকটি রাজনৈতিক দল, যেমন– আওয়ামী লীগ, কৃষক প্রজাপার্টি, নেজামে ইসলাম, গণতন্ত্রী দল এক জোট হয়ে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করে। যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা কর্মকসূচি নিয়ে নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। যুক্তফ্রন্টের প্রধান নেতারা ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফল

দল	প্রাপ্ত আসন
যুক্তফ্রন্ট	২৩৬
মুসলিম লীগ	০৯
খিলাফত-ই রাব্বানী	০১
কংগ্রেস দল	২৪
তফসিলী ফেডারেশন	২৭
খ্রিস্টান	০১
বৌদ্ধ	০২
কমিউনিস্ট পার্টি	০৪
নির্দলীয়	০৫
মোট	৩০৯

নির্বাচনে মুসলিম লীগের চরম পরাজয় ঘটে। শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের নেতৃত্বে ফ্রন্টের অন্যান্য শরীক দলের প্রতিনিধি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকরা যুক্তফ্রন্টকে বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে দেয়নি। মাত্র ৫৬ দিনের মাথায় ১৯৫৪ সালের ২৯ মে পূর্ব বাংলায় গভর্নর জেনারেল এক রুল জারি করেন। ৯২ (ক) ধারা জারি করে মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন বলবৎ করে।

যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং নির্বাচনের ফলাফলের তাৎপর্য

১৯৫৪ সালের ১১ মার্চের নির্বাচনে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং এর আহ্বানে নির্বাচনে তৎকালীন প্রাদেশিক শাসকগোষ্ঠীর ভরাডুবি এবং যুক্তফ্রন্টের বিশাল বিজয়ের মধ্য দিয়ে এর কতগুলো তাৎপর্য ফুটে ওঠে।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ কোন্দল, ইসলামি শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা এবং সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা, প্রদেশে বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় তল্পিবাহকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া, পূর্ব বাংলার উপর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত শোষণ ও বৈষম্য ইত্যাদি কারণে একদিকে মুসলিম লীগের পরাজয় ঘটে অন্যদিকে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। মুসলিম লীগ শাসক গোষ্ঠীর লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার দাবি অস্বীকার, জমিদার-জোতদার, ধনী-অভিজাত মুসলিম লীগের নেতৃত্বের গণ-বিচ্ছিন্নতা, বাংলাভাষার বিরোধিতা, সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলার উপর জোর করে সংখ্যাসাম্য নীতি চাপানো, হক, ভাসানী, সোহরাওয়ার্দীর মতো নেতৃবর্গকে মুসলিম লীগে ঠাঁই না দেয়া এবং রাষ্ট্রপরিচালনার স্বেচ্ছাচার বৈষম্য, পক্ষপাত, কেন্দ্রের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ এসবের বিরুদ্ধেই জনগণ নির্বাচনে গণরায় প্রদান করে 'যুক্তফ্রন্ট'কে বিজয়ী করেন।

যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং নির্বাচনে গণরায়ের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার মানুষের ভাষা ও ভূখণ্ডগত স্বাতন্ত্র্য চেতনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং জাতীয় চেতনাকে জাগরিত করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার অনুকূলে অভূতপূর্ব গণরায় ইঙ্গিত দেয় যে, পাকিস্তানে পূর্ববাংলা সকল ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই চালাতে প্রস্তুত। এতে পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের গতি তীব্রতর হয়। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা দানে বাধ্য করা হয়। পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাব বৃদ্ধি বাঙালি জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ, স্বায়ত্তশাসনের দাবি রাজনৈতিক সচেতনতা, যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচনে জয়লাভের ফলেই বিকাশ লাভ করে। স্বায়ত্তশাসনের দাবি স্বাধিকারের পথ ধরে স্বাধীনতার দিকে ধাবিত হয়। বাঙালি জনগণের রাজনৈতিক অগ্রগতিতে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। এ নির্বাচনের ফলেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ আরো সুদৃঢ় হয়।

যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নেতাগণ ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা শহীদের স্মৃতিকে অম্লান রাখার জন্য শ্রদ্ধাভরে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচিকে ২১টি দফায় লিপিবদ্ধ করে। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা অন্তর্ভুক্ত ছিল নিম্নরূপ কার্যাবলি সম্পাদন করা :

১. বাংলা হবে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা।

২. বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, মধ্যমস্বত্বের বিলোপ সাধন এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বণ্টন, ভূমি রাজস্বকে ন্যায়সঙ্গত স্তরে নামিয়ে আনা এবং সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল।

৩. পাট ব্যবসা জাতীয়করণ ও পাটের ন্যায্য মূল্য প্রদান করা হবে। মুসলিম লীগ আমলের পাট কেলেংকারীর তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান এবং তাদের অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ বাজেয়াপ্ত।

৪. সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা; কুটির শিল্পের বিকাশ ও শ্রমজীবীদের অবস্থার উন্নয়ন সাধন।

৫. পূর্ব বাংলাকে লবণের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে কুটির ও বৃহৎ পর্যায়ে লবন শিল্প প্রতিষ্ঠা।

৬. অবিলম্বে বাস্তুহারাদের পুনর্বহাল।

৭. সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা।

৮. পূর্ব বাংলাকে শিল্পায়িত করা এবং আই. এল. ও. (আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা) কনভেশন অনুযায়ী শিল্প শ্রমিকদের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান।

৯. অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন ও শিক্ষকদের জন্য ন্যায্য বেতন ও ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা।

১০. সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বিভেদ বিলোপ করে সমগ্র মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম নির্ধারণ।

১১. বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত সকল প্রতিক্রিয়াশীল কালাকানুন বাতিল করে একে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর।

১২. প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচ করা এবং উচ্চ ও নিম্ন বেতনভোগী সরকারি কর্মচারীদের বেতনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীগণের এক হাজার টাকার বেশি বেতন গ্রহণ না করার নীতি নির্ধারণ।

১৩. দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ঘুষখোরী উচ্ছেদ করা, এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালের পর হতে সকল সরকারি কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী কর্তৃক অর্জিত সম্পত্তির হিসাব গ্রহণ এবং সকল অবৈধ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা।

১৪. বিভিন্ন নিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স বলে আটকৃত সকল নিরাপত্তা বন্দিকে মুক্তিদান এবং সমিতি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান।

১৫. শাসন বিভাগ হতে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণ।

১৬. 'বর্ধমান' হাউসকে আপাতত ছাত্রাবাস এবং পরে বাংলা ও সাহিত্যের গবেষণাগার হিসেবে প্রতিষ্ঠা।

১৭. বাংলাভাষা ও সাহিত্যের জন্য যারা প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, তাদের পবিত্র স্মৃতিকে রক্ষা করার জন্য শহীদ মিনার নির্মাণ।

১৮. একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা ও একে ছুটির দিন হিসেবে পালন।

১৯. লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব বাংলার জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা এবং প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে রেখে অন্য সকল বিষয়ে পূর্ব বাংলার নিয়ন্ত্রণ আনয়ন, সেনা বাহিনীর সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে রেখে নৌবাহিনীর সদর দফতর পূর্ব বাংলায় স্থানান্তর, প্রতিরক্ষার ব্যাপারে পূর্ব বাংলাকে স্বয়ম্ভর করার জন্য এখানে অস্ত্র কারখানা স্থাপন করা এবং আনসার বাহিনীকে পূর্ণাঙ্গ মিলিশিয়া হিসেবে গড়ে তোলা।

২০. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কোনোক্রমেই আইনসভার আয়ু বর্ধিত করবে না। সাধারণ নির্বাচনের ছয় মাস পূর্বে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবে এবং নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা।

২১. আইনসভার কোনো আসন শূন্য হওয়ার তিন মাসের মধ্যে উপ নির্বাচনের মাধ্যমে এটা পূরণ করা হবে এবং যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীরা পরপর তিনটি উপনির্বাচনে পরাজিত হলে মন্ত্রিসভা থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যুক্তফ্রন্ট গঠিত হওয়ার তারিখ-

(ক) ১৯৫২ সালের, ২১ মার্চ (খ) ১৯৫৩ সালের, ২৪ জুন
(গ) ১৯৫৪ সালের, ১১ মার্চ (ঘ) ১৯৫৪ সালের, ২৬ মার্চ

২। যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচি ছিল-

(ক) ৬ দফা (খ) ১১ দফা
(গ) ১০ দফা (ঘ) ২১ দফা

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট গঠন ও এর তৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

২। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি বর্ণনা করুন

৩। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের গুরুত্ব ও ফলাফল লিখুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (খ), ২। (ঘ)

পাঠ-৪ : বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৬ দফা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছয় দফা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলনের পটভূমি

'পাকিস্তান' রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছিল লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে। লাহোর প্রস্তাবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হলেও পাকিস্তানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব বাংলার জনগণের উপর শুরু হয় পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতন। ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈষম্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে প্রকট আকার ধারণ করে। পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর অপশাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে পড়ে। সামরিক দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের অসহায় অবস্থা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে মুক্তির লক্ষে শুরু হয় স্বাধিকারের আন্দোলন। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলের এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উক্ত সম্মেলনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক 'ছয় দফা' কর্মসূচি পেশ করেন। এরপর তিনি জনমত সৃষ্টি করতে ছয় দফা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেন। ছয় দফা কর্মসূচিকে তিনি 'পূর্ব বাংলার বাঁচার দাবি' বলে অভিহিত করেন। বাঙালী জনগণ কর্তৃক উক্ত কর্মসূচি দ্রুত সমাদৃত হয়।

ছয় দফা কর্মসূচি

পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব বাংলাকে শোষণের বিরুদ্ধে ছয় দফা কর্মসূচি ছিল তীব্র প্রতিবাদ আর বাঙালির অধিকার আদায়ের সনদ বা মুক্তিসনদ। ছয় দফা কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ :

১ম দফা : লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্য সত্যিকার অর্থে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে। সরকার হবে সংসদীয় পদ্ধতির। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সকল প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটে জাতীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলো গঠিত হবে।

২য় দফা : যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে থাকবে দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়। অবশিষ্ট সকল বিষয় প্রদেশের হাতে থাকবে।

৩য় দফা : দেশের দুই অঞ্চলের জন্য দুটি পৃথক অথচ সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে অথবা দেশের দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। তবে সংবিধানে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে এক অঞ্চলের মুদ্রা ও মূলধন অন্য অঞ্চলে পাচার হতে না পারে।

৪র্থ দফা : সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা ও কর ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকবে তবে কেন্দ্রিয় সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য আদায় কৃত অর্থের একটি অংশ কেন্দ্রিয় সরকার পাবে।

৫ম দফা : বৈদেশিক বাণিজ্যি ও বৈদেশিক মুদ্রার উপর প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা থাকবে। সকল প্রকার বৈদেশিক চুক্তি ও সহযোগিতার ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকার দায়িত্ব পালন করবে। তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা যুক্তিযুক্ত হারে উভয় সরকার কর্তৃক মেটানো হবে।

৬ষ্ঠ দফা : আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য আঞ্চলিক সরকারগুলো স্বীয় কর্তৃত্বাধীন আধা সামরিক বাহিনী (প্যারা মিলিশিয়া) গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে।

ছয় দফা কর্মসূচির মূল আবেদন ছিল পূর্ব পাকিস্তান শুধু একটি প্রদেশ নয় বরং একটি স্বতন্ত্র স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। সকল প্রকার শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটানোই ছিল এর লক্ষ্য।

ছয় দফা আন্দোলন

ছয় দফা কর্ম সূচি পূর্ব বাংলার অবহেলিত ও স্বাধিকারকামী মানুষের নিকট দ্রুত সমাদৃত হয়। ছয় দফা কর্মসূচির জনপ্রিয়তা অর্জন ক্রমশ একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপ লাভ করে। স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের দোসর মোনায়েম সরকার ছয় দফা আন্দোলনকে 'রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলন' বলে অভিহিত করে। শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। বন্দি নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন ও হরতাল শুরু হয়। সভা ও শোভাযাত্রা বন্ধের জন্য সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। শেখ মুজিব সহ আওয়ামী লীগ নেতাগণ প্রতিটি মামলায় মুক্তি লাভ করেন। এতে আইয়ুব সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে আওয়ামী লীগ নেতাদের বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে নিত্য নতুন মামলা রুজু করে কারাগারে প্রেরণ করে। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন পূর্ব বাংলায় হরতাল আহ্বান করা হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে জনগণ স্বত:স্ফূর্তভাবে ছয় দফার পক্ষে সভা ও শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। এ আন্দোলনে প্রায় এক হাজার আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী গ্রেফতার এবং পুলিশের গুলিতে শত শত লোক আহত এবং ১২ জন নিহত হয়। ১৬ জুন পূর্ব বাংলার মুখপাত্র 'ইত্তেফাক' নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং এর সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)-কে গ্রেফতার করা হয়। এতসব সত্ত্বেও সরকার ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলন দমন করতে ব্যর্থ হয়। আন্দোলনের ফলে ছয় দফা জনগণের ম্যাণ্ডেট লাভ করে। শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জনগণের নিকট নির্ভীক, আপোসহীন ও ত্যাগী নেতায় পরিণত হন।

ছয় দফার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ছয় দফা কর্মসূচিকে পাকিস্তানের শাসক জেনারেল আইয়ুব খান বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মসূচি বলে আখ্যায়িত করেন এবং প্রবক্তাদের ওপর হয়রানি ও জুলুম শুরু করে। ছয় দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালিদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সনদ। ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলনে সরকারের নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা বাঙালিদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ছয় দফা আন্দোলনে অনেক নির্যাতন এবং অনেক তাজা রক্ত ঝরেছে। অনেক মায়ের বুক খালি হয়েছে। ছয় দফা এতই প্রবল ছিল যে অনেক অত্যাচার, নির্যাতন সত্ত্বেও বাঙালিরা আন্দোলন থেকে সরে যান নাই বরং আরও বেশি সংগঠিত হয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালি জনতা অকুণ্ঠ চিত্তে আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রবল প্রেরণা আসে ছয় দফার ঐক্য থেকে। তাই ছয় দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা যায়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য স্বৈরাচারী আইয়ুব-মোনায়েম সরকার নির্ভীক সাংবাদিক তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) কে গ্রেফতার, তার 'প্রিন্টিং প্রেস' বাজেয়াপ্ত, 'ইত্তেফাক' প্রকাশনা বন্ধ ঘোষণা এবং আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দকে গণহারে গ্রেফতার শুরু করে। ১৯৬৭ সালের, ২৩ জুন তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন জাতীয় পরিষদে বাঙালি সংস্কৃতি বিরোধী এই অজুহাতে রবীন্দ্র সংগীত বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারের উপর নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেন। এ সিদ্ধান্ত ঘোষণার সাথে সাথে প্রতিবাদের ঝড়

এবং আইয়ুব-মোনায়েম বিরোধী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। তখন সরকার শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে কিভাবে চিরতরে ধ্বংস করা যায় তার গোপন ষড়যন্ত্র করতে থাকে। এক পর্যায়ে সরকার ছয় দফা আন্দোলনের জন্য 'রাষ্ট্রদ্রোহিতার' অভিযোগে অভিযুক্ত ও দেশরক্ষা আইনে আটক শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি বেকসুর খালাস প্রদান করে। কিন্তু ১৮ জানুয়ারি পুনরায় গ্রেফতার করে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। এক সরকারি প্রেসনোটে বলা হয়, "শেখ মুজিবসহ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিরা ঢাকার ভারতীয় হাই কমিশনারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ হচ্ছিল। শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সহযোগিরা ভারতের আগরতলায় গোপন বৈঠক করে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার ষড়যন্ত্র করছিল।"

এই অভিযোগে অভিযুক্ত করে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে মোট ৩৫ ব্যক্তির বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' তৈরি করা হয়। ১৯৬৮ সালের ২১ এপ্রিল সুপ্রীমকোর্টের সাবেক বিচারপতি এম. এ. রহমানের নেতৃত্বে অর্ডিন্যান্সে নং ৫-১৯৬৮ নামে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। এই আইনে রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল করার সুযোগ ছিল না। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন কুর্মিটোলা সেনানিবাসে কঠোর নিরাপত্তায় 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যদের মামলা' শুরু হয়। শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহী প্রমাণ করে ফাঁসি দেওয়াই ছিল এই মামলার লক্ষ্য। কিন্তু একদিকে আইয়ুব-মোনায়েমের পাতানো ষড়যন্ত্রমূলক ও প্রসহনের মামলা চলতে থাকে অন্যদিকে গোটা দেশে সমগ্র জনগণের প্রতিবাদী শ্লোগান পৌঁছে যেতে থাকে বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে প্রত্যন্ত প্রান্তে। ১৪৪ ধারা, গুলি, নির্যাতন, গ্রেফতার সবকিছু উপেক্ষা করে বাঙালি জনগণ ধোঁকাবাজ, ষড়যন্ত্রকারী, লুটেরা শাসকদের মুখোশ উন্মোচন করে দেন। প্রহসনমূলক ও সাজানো এই 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বাঙালি জনগণকে আরও ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। অতি দ্রুত শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের একমাত্র নেতা এবং আওয়ামী লীগ সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সংগঠনে পরিণত হয়।

১৯৬৮ সালের ৭ ডিসেম্বর ঢাকা শহরে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। হরতালে ৪ জন নিহত, ৩০ জন আহত এবং তিন শতাধিক লোক গ্রেফতার হয়। পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ১৩ ডিসেম্বর হরতাল এবং জনতার 'ঘেরাও আন্দোলন' শুরু হয়। ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করলে আন্দোলনের গতি তীব্র আকার ধারণ করে। ৮ জানুয়ারি বিরোধী দলগুলো 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ যৌথভাবে একের পর এক আন্দোলনের কর্মসূচিতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আইয়ুব মোনায়েম নতি স্বীকার করে জনতার কাছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। আন্দোলনের মুখে ২১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তিদানের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ এবং রাজনৈতিক নেতৃবর্গের চাপে সরকার ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে। শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দিকে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদান করা হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে রেসকোর্স ময়দানে সংবর্ধনা সভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান

১৯৪৭ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত তৎকালীন পাকিস্তানের পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছিল, পূর্ব বাংলাকে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে, সামারিক বাহিনীতে, বেসামরিক প্রশাসনে এবং অর্থনীতিতে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। মৌলিক গণতন্ত্র, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং আইয়ুব শাহীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালে হরতাল, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ, সংগ্রাম, মিছিল-মিটিং, ঘেরাও আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্র জনতার ব্যাপক এক গণ-অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এটাই '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান নামে খ্যাত।

মৌলিক গণতন্ত্রের প্রহসন, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব বাংলা সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থা, ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠন এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের ভূমিকা, ছাত্রদের ১১ দফা দাবি ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমি তৈরি করেছিল। ১১ দফা কর্মসূচিতে শিক্ষার

সুযোগ বৃদ্ধি, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার, বাক-স্বাধীনতা, বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ, কৃষক শ্রমিকের সুযোগ-সুবিধাবৃদ্ধি, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি, জরুরি নিরাপত্তা আইন প্রত্যাহার, রাজবন্দিদের মুক্তি প্রভৃতি দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন ছাত্র নিহত হয়। এই ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে শুরু হয় সারাদেশে গণ-আন্দোলন। বিরোধী দলগুলো দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন শুরু করে। ডাকসুর সহসভাপতি ও ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদের নেতৃত্বে দেশের ছাত্রসমাজ ১১ দফা কর্মসূচি নিয়ে গণ-আন্দোলনে শরিক হয়।

আইয়ুব খানের পদত্যাগ, ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল, এক ব্যক্তি এক ভোটের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবিতে দেশব্যাপী প্রচণ্ড আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। আন্দোলনের ভয়ে ভীতি হয়ে আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করেন এবং শেখ মুজিবসহ সকল রাজবান্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি প্রদান করেন। বন্দি অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের পর ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যোন) এক বিশাল ছাত্র-জনতার সভায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বাঙালিদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এদিকে দেশের রাজনৈতিক শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা দূর করার লক্ষে সরকার ১৯৬৯ সালে রাওয়ালপিন্ডিতে সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দের গোলটেবিল বৈঠক ডাকেন। উক্ত বৈঠকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা হয়।

ক. প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে।

খ. যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতির প্রবর্তন করা হবে এবং

গ. মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে।

এ তিনটি বিষয়ে সকলেই একমত হন। কিন্তু ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি না মানায় আওয়ামী লীগ গোলটেবিল বৈঠক বর্জন করে এবং আন্দোলন অব্যাহত রাখে। ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাজনীতি থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

সারসংক্ষেপ

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব বাংলার জনগণের উপর শুরু হয় শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতন। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর অপশাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন এবং ১৯৬৮-এর ১১ দফা আন্দোলনের পথ ধরে ১৯৬৯ এ গণ-অভ্যুৎথান রূপলাভ করে। এ গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়েই স্বৈরাচারি সামরিক সরকারের পতন এবং ১৯৭০ এর নির্বাচন অনুষ্ঠানে পথ প্রশস্ত হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের উপর ভিত্তি করে স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি কে কোথায় ঘোষণা করেন-

(ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে বিরোধী দলের সম্মেলনে

(খ) খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকাতে মুসলিম লীগের মিটিং-এ

(গ) আইয়ুব খান করাচিতে গোলটেবিল বৈঠকে

(ঘ) মাওলানা ভাসানি ঢাকার জনসভায়

২। ৬ দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলার কারণ এটি-

(ক) ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা

(খ) বাঙালির ন্যায্য অধিকারের সনদ

(গ) মৌলিক অধিকারের ভিত্তি

(ঘ) বাঙালির যুদ্ধের্ প্রেরণা

৩। ছয় দফার কোন দফায় লাহোর প্রস্তাবকে ভিত্তি করা হয়েছে-

(ক) ২য় দফায় (খ) ১ম দফায়

(গ) ৫ম দফায় (ঘ) ৬ষ্ঠ দফায়

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কী?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। ১৯৬৬ এর ছয় দফাগুলো বর্ণনা করুন।

২। ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (ক), ২। (খ), ৩। (খ)

পাঠ-৫ : মার্চের অসহযোগ আন্দোলন এবং একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

অসহযোগ আন্দোলন-১৯৭১

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের ইতিহাসে সর্বপ্রথম প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ উভয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চের মধ্যে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের কথা বলেন। অপর দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যাতে ক্ষমতায় যেতে না পারেন সেজন্য আমলা, শিল্পপতি, সেনানায়করা এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং নির্বাচনের গণরায়কে অর্থাৎ বাঙালির বিজয়কে নস্যাত করার চক্রান্তে লিপ্ত হন। ১ মার্চ সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন এবং ২ ও ৩ মার্চ সান্ধ্য আইন জারি করেন। এর প্রতিবাদে ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারাদেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালিত হয়। সারাদেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। স্বাধিকারের আন্দোলন এবার বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ও দিক নির্দেশনায় স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়। সরকার এই আন্দোলন দমনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি এবং সেনাবাহিনী নিয়োগ করে। সেনাবাহিনীর গুলিতে জয়দেবপুরে বেশ কয়েকজন লোক মারা যান। আন্দোলনের গতি আরও বেগবান হয়। বঙ্গবন্ধু জয়দেবপুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ৩ মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভায় অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি ঘোষণা করেন আজ থেকে শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন চলবে। কলকারখানা, ব্যাংক, অফিস-আদালত, রেলগাড়ি সব বন্ধ থাকবে। খাজনা-ট্যাক্স দেওয়া চলবে না। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলার এই অবিসংবাদিত জননেতার ডাকে সাড়া দিয়ে সারা দেশে শান্তিপূর্ণভাবে অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচি পালন করে। ফলে পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রিয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ অচল হয়ে পড়ে। সকল কার্যক্রম বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই পরিচালিত হতে থাকে। ইয়াহিয়া খান সমস্যা নিরসনের লক্ষে ১০ মার্চ ঢাকায় সকল নেতৃবৃন্দের এক গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। বঙ্গবন্ধু এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'বাঙালির তাজা রক্ত মাড়িয়ে আমি কোন সম্মেলনে বসতে পারি না।"

পরিস্থিতি খারাপ দেখে ৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান পুনরায় ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের ঘোষণা দিয়ে নতুন কৌশল গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এ ভাষণ বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক স্মরণীয় দলিল। পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে সর্বকালের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে খ্যাত। তিনি লাখ লাখ জনতার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, "...ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। ..... তিনি আরও বলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম; রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব; তবু এদেশকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশালাহ।" বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর অসহযোগ আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালিরা মিছিলে মিছিলে সারা দেশ প্রকম্পিত করে তোলেন। শ্লোগান ওঠে 'তোমার আমার ঠিকানা– পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'ছয় দফা নয় এক দফা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা' বীর বাঙালি অস্ত্রধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর। প্রকৃতপক্ষে ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু, যাকে বহির্বিশ্বের সাংবাদিক পক্ষ "Poet of Politics" বা রাজনীতির কবি বলে অভিহিত করেছিলেন, বাঙালিদের স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানান। এভাবেই বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের পথ ধরে অসহযোগ আন্দোলন পরিণত হয় স্বাধীনতা আন্দোলনে।

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ

১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। ১৬ মার্চ থেকে ঢাকায় মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হয়। পরবর্তিতে পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ও পশ্চিম পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় নেতাগণ আলোচনায় যোগ দেন। আলোচনার পাশাপাশি আওয়ামী লীগের অসহযোগ আন্দোলনও চলতে থাকে। কিন্তু ইয়াহিয়া, ভুট্টো আলোচনার নাম করে গোপনে পূর্ব বাংলায় সামরিক সরঞ্জামসহ সেনাবাহিনী আনার কাজটি সুসম্পন্ন করেন। ১৭ মার্চ জেনারেল টিক্কা খান সামরিক বৈঠকে বাঙালি হত্যার নীল নকশা প্রণয়ন করেন। ১৯ মার্চ সামরিক বাহিনী জয়দেবপুরে গুলিবর্ষণ ও কারফিউ জারি করে। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবসে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আহ্বানে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে স্বাধীন বাংলার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্রলীগ নেতারা পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। আওয়ামী লীগ ‘প্রতিরোধ দিবস’ পালন করে। ২৪ মার্চ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সংকট সমাধানের লক্ষে শেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান কোনরকম ঘোষণা না দিয়েই সদলবলে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং ঐ রাতেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে হাজার হাজার নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালিকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে বন্দি হওয়ার পূর্বেই ওয়ারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রামের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের নিকট বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা পৌঁছে দেন এবং তা প্রচারের নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাটি ছিল ইংরেজিতে। আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তার বাংলা অনুবাদ করেন। স্বাধীনতা ঘোষণার বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ–

“পাকিস্তানের সেনাবাহিনী অতর্কিতে পিলখানার ই.পি.আর ঘাঁটি ও রাজারবাগ পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করেছে এবং শহরের লোকদের হত্যা করেছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের যোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। কোন আপস নেই। জয় আমাদের হবেই। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতা প্রিয় লোককে এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ্ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা। (*New York Times*, 16th January, 1972)।

ঘোষণা বার্তাটি চট্টগ্রাম শহরে রাতেই বিলি করা হয় এবং মাইকে প্রচার করা হয়। ২৬ মার্চ সকালেই স্বাধীনতার এই ঘোষণা চট্টগ্রাম শহরের সর্বত্র এবং গ্রামেও প্রচারিত হয়। পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই মধ্যরাতের পর ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণাটি বঙ্গবন্ধুর নামে আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান প্রচার করেন। চট্টগ্রামের কয়েকজন বেতার-কর্মী ও শিল্পী কালুরঘাট অস্থায়ী বেতারকন্দ্রে চালু করেন। উক্ত বেতার কেন্দ্র থেকে (আগ্রাবাদ) ২৬ মার্চ সর্বপ্রথম এম. এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের কৌশলগত কারণে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা একজন সামরিক কর্মকর্তার দ্বারা পাঠ করার গুরুত্ব অনুধাবন করেন। ঐ সময় চট্টগ্রামে কর্মরত নিকটস্থ সামরিক কর্মকর্তার মধ্যে মেজর জিয়াউর রহমানকে এ ব্যাপারে অনুরোধ করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়া বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ইংরেজিতে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। এ ব্যাপারে বাংলাদেশে নানারূপ তর্ক-বিতর্ক ও বিভ্রান্তিকর আলোচনা বর্তমান। যার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৮ সালে হাইকোর্ট বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে আইনগতভাবে বৈধতা প্রদান এবং সৃষ্ট বিতর্কের অবসান ঘটান।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে (মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাত তলার আম্রকানন) আওয়ামী লীগের নির্বাচিত গণ প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা এর আদেশনামা জারি করে এবং স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী

বাংলাদেশের ‘প্রবাসী সরকার’ গঠন করেন। ১৭ এপ্রিল নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে। প্রবাসী সরকার গঠনের সাথে সাথে বাংলাদেশের জনগণ পালিয়ে নানা প্রতিকূল পথ ধরে দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

মুজিবনগর অস্থায়ী সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন :

১. রাষ্ট্রপতি–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
২. উপরাষ্ট্রপতি–সৈয়দ নজরুল ইসলাম (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি)
৩. প্রধানমন্ত্রী–তাজউদ্দিন আহমেদ
৪. পররাষ্ট্র দপ্তর–খন্দকার মোশতাক আহমেদ
৫. অর্থ দপ্তর–ক্যাপ্টেন (অবঃ) মনসুর আলী
৬. স্বরাষ্ট্র ও পুনর্বাসন–এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান
৭. সেনাবাহিনী প্রধান–কর্নেল (অবঃ) এম. এ. জি. ওসমানী
৮. সেনাবাহিনীর উপপ্রধান–কর্নেল (অবঃ) এ. রব

অস্থায়ী সরকারের প্রতি অনুগত থেকে মুক্তিযোদ্ধারা ক্রমান্বয়ে সংগঠিত হয়ে রণাঙ্গণে পাক হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশের দোসরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গেরিলা যুদ্ধ, সম্মুখ যুদ্ধ, চোরাগোপ্তা হামলা প্রভৃতি নানা কৌশলের সমন্বয় করে সেনাপ্রধান আতাউল গনি ওসমানীর নেতৃত্বে যুদ্ধ চলে। পানিতে, আকাশে লড়াই চলে। সুষ্ঠু ও সুসংগঠিতভাবে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক সেক্টরের একজন করে সেক্টর কমাণ্ডারের নির্দেশনায় যুদ্ধ পরিচালিত হয়। ১৯৭১ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীও গড়ে ওঠে আনুষ্ঠানিকভাবে। নিয়মিত সেনা ব্যাটালিয়ান, সেক্টর ট্রুপস, মুক্তিবাহিনী, মুক্তিফৌজ, গেরিলা বাহিনী, নামে এরা মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এর মধ্যে গেরিলা বাহিনীর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশংসনীয়। গেরিলাদের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রী- কৃষক-শ্রমিকের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশি। এদের রণকৌশলও ছিল অভিনব ও নানামুখি।

এছাড়াও বাংলাদেশের ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক লেখকের লেখনী, প্রচার, বক্তৃতা বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তোলে। রেডিও, পত্র-পত্রিকা ও গোপন প্রচার পুস্তিকা মারফত দেশের ভিতরে এবং বিদেশে জনমত মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে ও হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিপক্ষে যেতে থাকে। এভাবে প্রচার সংগঠন, জনমতের জোয়ার বিবিসি’র সংবাদ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অব্যাহত প্রচার এবং গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে পাক হানাদার বাহিনী এবং তাঁদের এদেশীয় দোসররা। শুরু হয় বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি প্রদান। মিত্র দেশ ভারত ৬ ডিসেম্বর ‘বাংলাদেশ’কে স্বীকৃতি দিয়ে মুক্তিবাহিনীর সাথে যৌথভাবে পাকিস্তানি আক্রমণের জবাবে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। ফলে পাকিস্তানিরা এক পর্যায়ে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়। এভাবেই ৩০ লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে, ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম হারানোর বিনিময়ে, বিস্তর সহায় সম্পদ হারানোর বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পাক হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর বাঙালির বিজয় দিবসে পরিণত হয়।

সারসংক্ষেপ

২৪ বছরের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, অত্যাচার, নিপীড়ন, বঞ্চনা বাঙালিদের ক্ষুব্ধ বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তাই বাঙালিরা প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, আন্দোলন সংগ্রামের পথ ধরে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ১৯৭১ সালে প্রকৃতপক্ষে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়–

(ক) ১২ জানুয়ারি (খ) ৩ মার্চ

(গ) ১ ফেব্রুয়ারি (ঘ) ১ মার্চ

২। ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপর গণ-হত্যা শুরু করে-

(ক) ২৬ মার্চ (খ) ২৭ মার্চ

(গ) ২৫ মার্চ (ঘ) ২ মার্চ

৩। স্বাধীন বাংলার 'অস্থায়ী সরকার' গঠিত হয়–

(ক) ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল (খ) ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ

(গ) ১৯৭১ সালের ১২ এপ্রিল (ঘ) ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঘোষিত স্বাধীনতার বাণীটি লিখুন।

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিন।

২। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। খ, ২। গ, ৩। ক